বিপর্যস্ত অর্থনীতি শাস্ত্র:
বিপর্যয় কোথায় ও কী করা?

আবুল বারকাত
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;
অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(ই-মেইল: barkatabul71@gmail.com)

প্লেনারি বক্তৃতা

২০তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
ঢাকা: ২১-২৩ ডিসেম্বর, ২০১৭

স্থান: ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ, কাকরাইল, ঢাকা

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটি এবারের ২০তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে একজন প্লেনারি বক্তা হিসেবে আমাকে নির্বাচিত করার জন্য সমিতিকে ধন্যবাদ। "অর্থনীতি ও নৈতিকতা" নিয়ে কি বলবো এ নিয়ে বেশ ভেবে-চিন্তে এ সিদ্ধান্তে উপনিত হলাম যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে তার মধ্যেই থাকবো। আর যেহেতু এ বিষয়ে আমার সীমিত জ্ঞান-এর সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আমারই লেখা এ বছরে প্রকাশিত "অর্থনীতিশাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য"[১] শিরোনামের গ্রন্থে সেহেতু গ্রন্থে বিশ্লেষিত বিষয়াদির মধ্যেই থাকবো। এখানে গ্রন্থ পরিচিতির প্রয়োজন নেই।

"অর্থনীতি ও নৈতিকতা" বিষয়টি বহুমাত্রিক ও জটিল। এ কথা মাথায় রেখে আজকের প্লেনারি বক্তৃতায় অর্থনীতি ও নৈতিকতা কেন্দ্রিক যে বিষয়গুলি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই তা হলো: (১) অর্থনীতিশাস্ত্রে নীতি-দর্শনের দারিদ্র্যের মর্মকথাটি কী? (২) অর্থনীতিশাস্ত্রে নীতি-দর্শনের দারিদ্র্য দূর করতে করণীয় কী হওয়া উচিত? এবং (৩) জ্ঞানশাস্ত্রের নিরিখে অর্থনীতিশাস্ত্রের পঠন-পাঠনে পরিবর্তনের সম্ভাব্য পথনির্দেশনাটা কেমন হতে পারে? শুরুতেই বলে রাখি যেহেতু প্লেনারি বক্তৃতার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ তিন প্রশ্নের বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ নেই (এবং উল্লিখিত গ্রন্থে এসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আছে) সেহেতু বক্তব্যও হবে অনুরূপ, সময়ের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। আবার শুরুতেই আমার উপসংহারিক মূল কথাটিও বলে রাখি: **"অর্থনীতিশাস্ত্র আজ বিপর্যস্ত। তবে পরিত্রাণের পথও আছে"।**

২. অর্থনীতিশাস্ত্রে নীতি-দর্শনের দারিদ্র্য: মর্মকথাটা কী?

আনুষ্ঠানিক অর্থে অর্থনীতিবিদদের প্রথম দলের শুরুটা ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় টমাস বেকনসহ বেশ কিছু ধর্মযাজকের সমন্বয়ে। ষোড়শ শতকের এসব অর্থশাস্ত্রীর চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রীয় প্রশ্ন ছিল – কীভাবে অর্থনৈতিক জীবনের নৈতিক ভিত্তি পুনর্গঠন করা যায়? তখন থেকে আজকের একবিংশ শতক পর্যন্ত বিগত সাড়ে পাঁচ শত বছরের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ১৯৬০ দশক যখন থেকে নব্য-উদারবাদীদের উত্থান – এ সময়টুকু বাদ দিলে পিছনের ৫০০ বছরের অর্থনীতিশাস্ত্র মূলত দুটি বৃহৎ বর্গের প্রশ্নগুচ্ছের উত্তর অনুসন্ধান করেছে: (১) সম্পদের উৎস কী? কে সম্পদের স্রষ্টা? সম্পদ কোথায় সৃষ্টি হয়? (২) বাজার ব্যবস্থা কীভাবে চলা

[১] আবুল বারকাত, ২০১৭, অর্থনীতি শাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

উচিত? মুক্ত-অবাধ বাজার, মুক্ত কর্মপ্রচেষ্টা, মুক্তবাণিজ্য নাকি বাজারে ভূস্বামী-সামন্তপ্রভু-রাজা-সম্রাট-রাষ্ট্র-সরকারের হস্তক্ষেপ-নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ব থাকতে হবে? অর্থশাস্ত্রে অনুসন্ধানের বিষয় হিসেবে এসব বিগত ৫০০ বছরের বিষয় নয়। লিখিত হিসেবে এসব বিগত আড়াই হাজার বছরের বিষয়।

অর্থনীতিশাস্ত্রের চিন্তার ইতিহাসের বিগত সাড়ে পাঁচ শত বছর উল্লিখিত দুই প্রধান বিষয়ের নির্মোহ-বস্তুনিষ্ঠ-সর্বজনীন বিজ্ঞানসম্মত কাঠামোতে সূত্রবদ্ধ কোনো সদুত্তর মেলেনি। সদুত্তর মেলেনি তার প্রধান কারণ সমসাময়িককালে অর্থনীতিশাস্ত্রের এসব বিষয়ে যাঁরা চিন্তা-ভাবনা করেছেন, তাঁদের প্রায় সবাই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাঁর (তাঁদের) কালের ভূস্বামী-সামন্তপ্রভু-রাজা-বাদশাহ-সম্রাট-প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রীসহ ঐ কালের নিয়ামক-নিয়ন্ত্রক শ্রেণির (dominant class) শ্রেণিস্বার্থ রক্ষাকারী আজ্ঞাবাহী মাত্র। তাঁরা প্রধানত তাঁদের কালের শাসকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করেছেন – মাত্রা, ধরন এবং তীব্রতা যা-ই হোক না কেন। কেউ কেউ আবার সমকাল ছাপিয়ে আগত-সমাগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বার্থ রক্ষা করেছেন। কেউ স্বার্থ রক্ষা করেছেন দাসভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জিইয়ে রাখতে, কেউ স্বার্থ রক্ষা করেছেন সামন্তবাদ টিকিয়ে রাখতে, কেউ স্বার্থ রক্ষা করেছেন ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী যুগে আগত নতুন শ্রেণির, কেউ স্বার্থ রক্ষা করেছেন পুঁজিবাদের, কেউ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদের, আবার কেউ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও আধিপত্যবাদের। অধিকাংশেই তেমন যুগ-কাল নির্বিশেষে অর্থনীতি নিয়ে সার্বজনীন নির্মোহ তত্ত্ব বিনির্মাণের চেষ্টা করেননি। এসব কারণেই নীতি-নৈতিকতার নিরিখে অর্থনীতিশাস্ত্রের 'বিপর্যয়' ও 'দর্শনের দারিদ্র্য' উৎপাদিত-পুনরুৎপাদিত হয়েছে।

'দর্শন শাস্ত্রের' কাজ বলতে যদি জগৎ, জীবন, মানুষের সমাজ এবং তার চেতনা ও জ্ঞানের প্রক্রিয়ার মৌল বিধান নিয়ে ভাবনা-চিন্তা বুঝায় (যাকে আমি "চিন্তা নিয়ে চিন্তা করা" বলি) আর 'অর্থনীতিশাস্ত্রের' কাজ বলতে যদি বুঝায় সম্পদ সৃষ্টির উৎস ও বাজার-সম্পর্কিত জটিল বিষয়াদির সাধারণ সূত্রসমূহ গড়ে তোলা–সেক্ষেত্রে বিগত সাড়ে পাঁচ শত বছরের অর্থনীতিশাস্ত্র তার শাখা-প্রশাখাসহ আসলেই "দর্শনের দারিদ্র্য" নির্দেশ করে। ব্যতিক্রম শুধু কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)-এর অর্থনীতি সাহিত্য যেখানে অতীতের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী পদ্ধতিতত্ত্ব (methodology) প্রয়োগে বৈজ্ঞানিক বিধি-বিধানের ভিত্তিতে সামাজিক বিশ্ববীক্ষার (social cosmology) আওতায় শুধু ঐতিহাসিক উত্তরণশীল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাতত্ত্বই (Theory of Socio-economic Formation) আবিষ্কৃত হয়নি, যেখানে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে যে যেকোনো আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাই স্থির-অনড় নয়, তা নিয়ত পরিবর্তনশীল।

কার্ল মার্কস পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-ব্যবচ্ছেদ করেছেন। মার্কসের পুঁজিবাদ বিশ্লেষণের এ কাঠামোসূত্রে নির্মোহতা আছে, সমগ্রতা আছে, বস্তুনিষ্ঠতা আছে, ঐতিহাসিকতা আছে আর সর্বোপরি আছে সর্বজনীনতা। অন্যেরা যে শ্রেণির স্বার্থরক্ষার কথা ভেবেছেন মার্কস ঠিক তার বিপরীত পক্ষের স্বার্থ রক্ষার কথা ভেবেছেন এটা ঠিক কিন্তু সে কারণে তিনি অর্থনীতিশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় 'দর্শনের দারিদ্র্য' দূর করতে পেরেছিলেন তা ঠিক নয়, যেটা সঠিক তা হলো দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তিতে অর্থনীতিশাস্ত্র বিচার-বিশ্লেষণে তার বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের বস্তুনিষ্ঠ-নির্মোহ প্রয়োগ–তা না হলে মার্কস কখনও মূল্যের শ্রমতত্ত্বে পণ্যমূল্য বা পণ্য বিনিময় মূল্য নির্ধারণে বিমূর্ত শ্রমের (abstract labor) বিষয়টি উপস্থাপন করতে পারতেন না (যে বিষয়টি ছিল হাজার হাজার বছর ধরে অনাবিষ্কৃত; সিরিয়াস অর্থনীতিশাস্ত্রীদের গভীর চিন্তা-দুশ্চিন্তার বিষয়; অর্থনীতিশাস্ত্রের ইতিহাসে অন্যতম সর্ববৃহৎ ধাঁধা), তা না হলে মার্কস কখনও এ উপসংহারে উপনীত হতে পারতেন না যে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের অনিবার্যতার কারণে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী।

মার্কসের আগে ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের জনক এডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০) অর্থশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় দর্শনকে সুসংহত-সুসংবদ্ধভাবে অন্তত মূল্যের শ্রমতত্ত্ব ও বাজারের জটিল বিষয়াদির বিশ্লেষণ করে সূত্রবদ্ধ করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। "প্রাকৃতিক স্বাধীনতাভিত্তিক ব্যবস্থায়" (system of natural liberty) বিশ্বাসী এডাম স্মিথ একদিকে বলেছেন, "বাজারের অদৃশ্য হাত" (invisible hand of market) "স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সামাজিক ভারসাম্য নিশ্চিত করবে" আবার অন্যদিকে বলেছেন, "ব্যবসায়ীদের মধ্যে জনস্বার্থ-বিরোধী ষড়যন্ত্র প্রবণতা আছে"। এক্ষেত্রে স্মিথের "স্বনিয়ন্ত্রিত বাজার" তত্ত্বের কি হবে? আবার তিনি বড় ভুল করে ফেলেছেন যখন বলছেন, "পণ্য প্রথা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে, এটা তার স্বভাবজাত।" আর তাই অর্থনীতিশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় দর্শনের শুরুটাই 'দর্শনের দারিদ্র্য' দিয়ে – এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

এডাম স্মিথের ধ্রুপদী অর্থনীতি দর্শনের অন্যতম ভ্রান্তিকে বলা হয় – "এডামের বিভ্রান্তি" বা "এডামের যুক্তি-ভ্রান্তি" (Adam's Fallacy)। বিষয়টি এ রকম: এডাম স্মিথের আগে অর্থনীতিশাস্ত্র যখন সার্বভৌম সরকারদের বুদ্ধি পরামর্শ দিত যে কীভাবে সরকারি নীতিকৌশল বিশেষত সরকারি আর্থিক নীতি বিনির্মাণ করে বাজারের সম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতা সরকারের পক্ষে বাড়ানো যায় সেখানে স্মিথ অর্থনীতিবিদদের এ ভাবনা-ক্ষেত্র প্রসারিত করলেন। এ প্রক্রিয়ায় তিনি ভাবলেন সমাজ কীভাবে আরো বেশি ফলপ্রদ আরো বেশি উৎপাদনশীল হতে পারে, এবং

সেক্ষেত্রে বাজারসহ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যক্তিজীবনের সম্পর্কটা কেমন হতে হবে। তিনি বললেন, আধুনিক সমাজ বৃহৎ দুটি বর্গে বিভক্ত যার মধ্যে সংহতি হতে হবে: প্রথম বর্গ হলো ব্যক্তিজীবন, আর দ্বিতীয় বর্গ হলো সমাজজীবন। এরপর তিনি যা বললেন তা হলো এ রকম: অর্থনৈতিক জীবনে ব্যক্তির উদ্যোগ ও পারস্পরিক যোগসূত্র ব্যক্তি-নির্ভরহীন সূত্র দিয়ে পরিচালিত হয় যা ব্যক্তির নিজস্বার্থ বা স্ব-স্বার্থের জন্য উপকারী; আর ব্যক্তির স্ব-স্বার্থকেন্দ্রিকতার বাইরে আছে রাজনীতি, ধর্ম এবং নীতি-নৈতিকতাসহ সমাজজীবন। এডাম স্মিথের মূল কথা হলো ব্যক্তির স্ব-স্বার্থের সাথে সামাজিক জীবনের সংহতি (বা সম্মিলন) হতে হবে – আর এ সংহতি সাধনের একমাত্র মাধ্যম হলো ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ নিমিত্ত 'বাজারের অদৃশ্য হাত' (মুক্ত বাজার)। এ ক্ষেত্রে স্মিথের 'বিভ্রান্তি' (Adam's Fallacy) হলো তার স্ব-বিরোধী বক্তব্য যে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি এমন একটি প্রণালী বা ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তির স্বার্থপরতা অন্য সবার মঙ্গল বয়ে আনে। এখানে স্মিথের অবস্থানের নৈতিক ভ্রান্তি (moral fallacy) হলো বিমূর্ত ভাল (abstract good) কোনো কিছু পাবার আশায় তিনি আমাদের মূর্ত ও প্রত্যক্ষ (concrete and direct) মন্দ বা শয়তানকে বেছে নিতে বলছেন। আর যুক্তিগত ভ্রান্তি (logical fallacy) হলো স্মিথসহ কেউই এ পর্যন্ত প্রমাণ করতে সক্ষম হননি যে কীভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা সমষ্টির জন্য ভাল হয়; আর মনস্তাত্ত্বিক ব্যর্থতা (psychological failure) হলো স্মিথের যুক্তি মেনে নিলে পুঁজিবাদের উন্নয়ন ফল হিসেবে বৈষম্য থেকে শুরু করে কমজোরি সবার উপর পুঁজিবাদের ঋণাত্মক প্রভাব-অভিঘাত মেনে নিতে হয়।

মার্কসের আক্রমণে আক্রান্ত হয়ে বুর্জোয়া অর্থনীতিশাস্ত্রের মার্কস পরবর্তী ধারাসমূহ অর্থনীতিশাস্ত্রকে 'খণ্ডিত' ও 'কামরাভুক্ত' বা 'গণ্ডিবদ্ধ' করে (fragmentation and compartmentalization) যত ধরনের উপযোগিতার তত্ত্ব (utilitarian concepts) খাড়া করা যায় তা দিয়ে ধ্রুপদী চিন্তা জগতের (classical schools) মূল্যের শ্রমতত্ত্বকেই বিসর্জন দিল (এখানে প্রধান গুরু হলেন জেরেমি বেন্থাম, ১৭৪৮-১৮৩২)। এসব করা হলো বেশ সচেতনভাবেই এবং এর ফল যা হবার তাই হলো। অর্থনীতিশাস্ত্র যুক্তির জগৎ থেকে নিজেকে সযত্নে সরিয়ে নিল, ফলে শাস্ত্রের 'দর্শনের দারিদ্র্য' মহাদারিদ্র্যে রূপান্তরিত হলো।

অর্থশাস্ত্রের পশ্চাদপসারণের ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষা বিশেষত সমাজতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পতন পরবর্তীকালে একমেরুর বিশ্বে বৈশ্বিক সব মৌল-কৌশলিক প্রাকৃতিক সম্পদে (জমি সম্পদ, জল সম্পদ, জ্বালানি-খনিজ সম্পদ, আকাশ-মহাকাশ সম্পদ) আধুনিক

সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একক নিরঙ্কুশ মালিকানা (absolute ownership) ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ (absolute control) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অর্থনীতিশাস্ত্রে আবির্ভূত হয়েছে নব্য-উদারবাদী মতবাদ (Neo-liberal doctrine)।

অর্থনীতিশাস্ত্রে নব্য-উদারবাদী মতবাদ কোনো সুস্থিত দর্শন নয়। আর বিশ্বে পুঁজি যখন কেন্দ্রে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদসহ পশ্চিমা ধনী দেশে উদ্বৃত্ত তখনই এ মতবাদ নতুন করে শুধু মুক্তবাজার, অবাধ বাণিজ্য, নিরঙ্কুশ ব্যক্তিমালিকানার কথা বলেই ক্ষান্ত হয় না, দুনিয়া কব্জা করতে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষাকারী বৈশ্বিক আর্থিক ও বাণিজ্যিক সংস্থা গড়ে তুলে বিশ্ববাজার, বিশ্ববাণিজ্য, বিশ্ব অর্থনীতি পরিচালনের মারাত্মক সব বিধি-বিধান-নিয়ম-কানুন রচনায় ব্যস্ত। এবং শুধু তাই নয় ঐসব একপেশে বিধি-বিধান-নিয়ম-কানুন না মেনে চললে দুর্বলের শাস্তির বিধান তৈরিরও দায়িত্ব তাঁরা নিজে নিজেই নিয়েছেন, ফলে দুর্বল দেশের– উন্নয়নশীল, উন্নয়নকামী, স্বল্পোন্নত, 'গরীব' দেশ– সার্বভৌমত্ব বলে কিছু থাকছে না। এ এক মহাবিপর্যয় – প্রাকৃতিক নয়, মনুষ্যসৃষ্ট। এ অবস্থাকে বলা চলে "অর্থনীতিশাস্ত্রের রাজনৈতিক স্বেচ্ছামৃত্যু" ("political euthanasia of economics")।

অর্থনীতি শাস্ত্রের রাজনৈতিক এই স্বেচ্ছামৃত্যু আকস্মিক নয়। এখন বিশদে না গিয়ে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ-এর প্রণিধানযোগ্য একটি বক্তব্য উল্লেখ করি যেখানে তিনি বলছেন, "**... বাজারের ক্ষমতা প্রবল, কিন্তু উদ্ভবসূত্রেই নেই তার কোনো নৈতিক চরিত্র**।... তারপরেও বাজার অর্থনীতি এমনকি যখন মোটামুটি স্থিতিশীল, তখনও উচ্চমাত্রার অসমতা সৃষ্টি করে, যার পরিণাম অন্যায্য।... পুঁজিবাদ যা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা দিতে পারেনি, আর যা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়নি তা দিয়েছে – অসমতা, পরিবেশ দূষণ, বেকারত্ব এবং (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ) মূল্যবোধের এমন অবক্ষয়াবস্থা যেখানে সবকিছুই গ্রহণযোগ্য এবং যেখানে কেউই জবাবদিহি করবে না।... (কিন্তু) শ্রেণিভিত্তিক সমাজ বলতে যদি বুঝি যে নিচের শ্রেণির উপরের শ্রেণিতে উঠবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে সেক্ষেত্রে আজকের আমেরিকা পুরাতন ইউরোপের তুলনায় অনেক বেশি শ্রেণিভিত্তিক সমাজ।"[২]

---

[২] দেখুন, Joseph Stiglitz, 2013. The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. London: Penguin Books, পৃ. xxxix, xliii, l, xlvi. আর "মানুষে মানুষে অসাম্য কেন হয়, কীভাবে হয়, হলে কী হয়? আধুনিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাস্তবতা"– এ নিয়ে বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৬, বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা। পৃ. ১৬১-১৭৫।

অর্থনীতিশাস্ত্র গত পাঁচ শত বছর যাবৎ যেভাবে এগিয়েছে এবং যা পেরেছে ও পারেনি তা থেকে বুঝা যায় এ শাস্ত্র জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে অথবা বলা যায় এ শাস্ত্র জনকল্যাণ করার কথা ভাবেনি অথবা বলা যায় এ শাস্ত্রে 'জনকল্যাণ' বিষয়টি **লক্ষ্য না হয়ে উপলক্ষ্য** হয়েছে অর্থাৎ অন্য কোনো কিছু করতে গিয়ে 'জনকল্যাণ' এসে পড়েছে মাত্র। নীতি-নৈতিকতার নিরিখে অর্থনীতিশাস্ত্রের মর্মার্থ বিবর্তন-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে আমি মনে করি যে "অর্থনীতিশাস্ত্র ব্যর্থ" হয়েছে (failure of economics)। এ ব্যর্থতা তিন ধরনের:

১. *বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতা (Intellectual failure):* মূলধারার অর্থশাস্ত্রে যে বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতা তার প্রধান উৎস হলো এ বিশ্বাস যে শেষ পর্যন্ত "বাজার নিজেই নিজেকে সংশোধন করে" অথবা "বাজারই সে ফিল্টার যা দিয়ে সবকিছু সংশোধিত হয়ে যায়" অথবা "বাজারের অদৃশ্য হাত স্বয়ংক্রিয়ভাবে সব সমস্যার সমাধান করে দেয়" (যাকে বলে "markets are self-correcting")। বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতার আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে, যা নিয়ে তেমন ভাবনা নেই বললেই চলে। তা হলো 'অর্থনীতি' বললেই প্রায়ই 'বাজার'কে নির্দেশ করা হয়; অথচ ধারণা হিসেবে 'বাজার'-এর তুলনায় 'অর্থনীতি' অনেক ব্যাপক, গভীর ও জটিল বিষয়। প্রচলিত শাস্ত্রে এ অবস্থা শাস্ত্রের দৈন্যদশারই পরিচয় বহন করে। যেহেতু 'অর্থনীতি' আর 'বাজার'-এ দুটি ধারণাকে প্রায় সবাই সমার্থক মনে করেন (যা আসলে নয়া-ধ্রুপদী অর্থনীতিশাস্ত্রের কথা) আর যেহেতু অর্থনীতিশাস্ত্রে "বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতার" এটাই অন্যতম উৎস, সেহেতু বিষয়টি একটু বিশ্লেষণ দরকার। নয়া-ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রীদের মতে অর্থনীতি– যে কোনো দেশের যে কোনো কালের হলো– "বহু ধরনের বিনিময় সম্পর্কের সমাহার" (যাকে বলে web of exchange relationships), যেখানে একক ব্যক্তি পণ্যদ্রব্য কেনেন, যা অনেক কোম্পানিতে উৎপাদিত হয় তবে তিনি তার শ্রম বিক্রি করেন একটি কোম্পানিতে; আর কোম্পানিরা কেনাবেচা করে অনেক ব্যক্তির ও অনেক কোম্পানির সাথে। এখান থেকেই বলা হয় "অর্থনীতি" মানেই 'বাজার'। আসলে এ কথা ভ্রান্ত। আসলে 'বাজার' হলো অর্থনীতিকে সংগঠিত করার অনেক পথ-পদ্ধতির একটি মাত্র। কারণ কোম্পানির অনেক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডই কোম্পানির ভেতরেই ঘটে থাকে (যাকে বলে through internal directives); অর্থনীতির বড় এক অংশের উপর সরকারের প্রভাব আছে আর অনেক ক্ষেত্রে সরকার তা নিয়ন্ত্রণও করে; সরকারসহ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা যেমন বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (World Trade

Organization) বাজার সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান বানিয়ে বাজারের পরিধি নির্ণয় করে দেয়। আর অর্থনীতিশাস্ত্রে আচরণবাদী স্কুলের প্রবক্তা হার্বার্ট সাইমন হিসেবপত্তর কষে দেখিয়েছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহের মাত্র ২০ শতাংশ 'বাজারের' মাধ্যমে সংগঠিত হয়। সুতরাং 'অর্থনীতি' মানেই 'বাজার' অথবা 'বাজার'ই 'অর্থনীতি' – এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

২. *নীতি-নৈতিকতার ব্যর্থতা (Moral failure):* নীতি-নৈতিকতা-সংশ্লিষ্ট এ ব্যর্থতার প্রধান উৎস হলো "অর্থ অথবা টাকার জোরভিত্তিক সিস্টেম" অর্থাৎ যাকে বলা হয় "অর্থ-পূজাভিত্তিক সিস্টেম"-এ বিশ্বাস। বিষয়টি জন্ মেইনার্ড কেইনস্ বলেছিলেন এভাবে: "বস্তুজাগতিক প্রগতি ঐ বিন্দু পর্যন্তই মানবকল্যাণ-মানবসমৃদ্ধি বাড়াবে, যখন তা নৈতিক-বস্তুর সংখ্যা কমাতে থাকবে" ("Material progress will increase the welfare of the universe upto the point when it starts to diminish the quantity of ethical goods")। অর্থশাস্ত্রে নীতি-নৈতিকতা-সংশ্লিষ্ট ব্যর্থতা ঘটছে এ কারণে যে আমরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্যই "প্রবৃদ্ধি পূজা" করছি, "ভালো জীবনের" জন্য নয় (not for good life)। এ ব্যর্থতা ঘটছে এ কারণে যে "অর্থনৈতিক জীবনসমৃদ্ধি" বললে আমরা বুঝি শুধু কিছু বস্তুগত পণ্যের সমাহার মাত্র। এ ব্যর্থতার মূলে হলো "বস্তুগত প্রগতির" সাথে "নৈতিক-প্রগতির" সম্পর্ক না বুঝা অথবা মনে করা যে "বস্তুগত জীবনমান উন্নয়ন" হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবেই "নৈতিক-মূল্যবোধগত উন্নতিও" হয়ে যাবে। "চিরায়ত অর্থশাস্ত্র" এসব দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে; "উপযোগবাদ" তা বাড়িয়েছে; আর "নব্য-উদারবাদ" তা সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত "নৈতিক মূল্যবোধ" বিষয়টিই অবলুপ্ত প্রায়।

৩. *প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা (Institutional failure):* আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানই "ফলপ্রদ বাজার তত্ত্বে" বিশ্বাস করে বসে আছে। এ তত্ত্ব অনুযায়ী তারা মনে করেন যে আর্থিক বাজার লাগাতারভাবে সম্পদের ভ্রান্ত-মূল্য নির্ধারণ করতে পারে না এবং সে কারণেই অর্থবাজারকে তেমন নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজন নেই। আমার মতে এ ব্যর্থতা উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যর্থতার প্রতিফল মাত্র।

সুতরাং অর্থনীতিশাস্ত্র এখন তিন ধরনের ব্যর্থতা নিয়ে এগুনোর চেষ্টা করছে: বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতা, নীতি-নৈতিকতার ব্যর্থতা, এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা। বাজারের

শক্তিতে অতি বিশ্বাস অথবা নির্বিচার বিশ্বাস এবং অনৈতিক অর্থ-পূজা সম্ভবত এ দুটো থেকেই এ তিন ব্যর্থতার সৃষ্টি। মানুষের জীবনসমৃদ্ধি এবং জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে "বিপর্যস্ত অর্থনীতিশাস্ত্রকে" এসব নিয়ে ভাবতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতা, নীতি-নৈতিকতার ব্যর্থতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে এসবের কারণ-পরিণাম নিয়ে নির্মোহভাবে ভাবতে হবে। বিপর্যস্ত অর্থনীতিশাস্ত্রকে এ তিন ব্যর্থতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

৩. বৈশ্বিক মহাবিপর্যয় রোধে অর্থশাস্ত্রের কী করার আছে?

এহেন মহাবিপর্যয় থেকে মনুষ্য সমাজকে মুক্তি দিতে সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য ও বিশ্ব-কব্জাকরণ প্রক্রিয়া থেকে অর্থনীতিশাস্ত্রকে বেরিয়ে আসতে হবে। এ ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের ইতিহাসের অবসান ত্বরান্বয়নে অনেকের সাথে অর্থনীতিশাস্ত্রকেও দায়িত্ব নিতে হবে। অর্থনীতিশাস্ত্রকে শাস্ত্রীয় 'দর্শনের মহাদারিদ্র্য' থেকে বেরিয়ে আসতে হবে – যত না শাস্ত্রের প্রয়োজনে তার চেয়ে অনেক বেশি বিশ্ব-জনগণের ভবিষ্যৎ প্রাগ্রসর জীবনের প্রয়োজনে। এখন অর্থনীতিশাস্ত্রের কাজ হবে চরম বৈষম্যমূলক অসম বিশ্বের রাজনৈতিক-অর্থনীতির অন্তর্নিহিত নিয়ামক বিষয়াদির বস্তুনিষ্ঠ-নির্মোহ বিশ্লেষণপূর্বক 'নতুন এক একীভূত অর্থশাস্ত্র' (New Unified Economic Science) বিনির্মাণ করে তারই ভিত্তিতে 'নতুন মানবিক উন্নয়ন দর্শন' (New Humane Development Philosophy) প্রণয়ন যার নিহিতার্থ তথাকথিত নির্বিচার প্রবৃদ্ধি নয় অর্থাৎ – "non differentiated growth" নয় অথবা (একই কথা) "unqualified growth" নয়। একীভূত অর্থশাস্ত্রীয় ঐ তত্ত্বের কার্যকর প্রয়োগ একদিকে ধনী দেশের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা রোধ করতে সক্ষম হবে; আর অন্যদিকে একই সাথে দরিদ্র দেশের মানবিক উন্নয়ন-প্রগতি প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। এ দর্শনের লক্ষ্য হবে কোনো একটি সুনির্দিষ্ট দেশের অথবা সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সিস্টেমের অথবা সুনির্দিষ্ট শ্রেণির লাভ নয় – এ দর্শনের লক্ষ্য হবে 'বৈশ্বিক প্রগতি' বা "বৈশ্বিক লাভ"। আর এ লক্ষ্যে অর্থনীতিশাস্ত্রীদের অন্যান্য অনেক কিছুর পাশাপাশি চিকিৎসাশাস্ত্রের হিপপোক্রাটিক নীতি অনুসরণে একটি শপথবাক্য (Oath অর্থে) পাঠ করা উচিত: "প্রথমকথা হলো – ক্ষতি করো না।"

বিষয়টি অর্থনীতিশাস্ত্রের দর্শনগত তবে সমাধান রাজনৈতিক। যেহেতু মানুষের বিবর্তনে ৯৯ শতাংশ সময়কাল কেটেছে সমতাভিত্তিক সামাজিক কাঠামোতে (আদিম সাম্যবাদী আর্থ-সামাজিক পদ্ধতিতে বা ব্যবস্থায়); যেহেতু মানুষ যে আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে বাস করে তা স্থির-অনড় নয় (static নয়) তা নিয়ত পরিবর্তনশীল (dynamic) এবং শেষ বিচারে প্রগতিমুখী; যেহেতু বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ মানুষকে উত্তরোত্তর অধিক হারে আলোকিত করতে থাকবে; এবং যেহেতু

জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-মানবশ্রম-দক্ষতাসহ উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত বিকাশ বিদ্যমান আপাতদৃষ্টিতে 'অসীম শক্তিধর' উৎপাদন সম্পর্ককে পাল্টে দেবে–সেহেতু প্রাকৃতিক কারণেই মানবকল্যাণকামী বৈশ্বিক এ সমাধান কোনো আপ্তবাক্য নয়–ব্যাপারটা সময়ের। জটিল এ প্রক্রিয়ার কার্যকারণ ব্যাখ্যা-বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক পৃথিবীর মানুষকে সঠিক পথনির্দেশনা দিতে হয়তো বা প্রয়োজন সামাজিক বিজ্ঞানের কার্ল মার্কসের মতো 'মহাজ্ঞানী' দার্শনিকসহ প্রকৃতি বিজ্ঞানের কোপার্নিকাসের (১৪৭৩-১৫৪৩) মতো 'মহাবিজ্ঞানী' ও 'জ্ঞানশাস্ত্রের মহাগৌরব' গিওর্দানো ব্রুনোর (১৫৪৮-১৬০০) মত নির্মোহ দার্শনিকদের সমন্বিত উদ্যোগ। কিন্তু ততক্ষণ বসে না থেকে আমাদের কাজ হবে অনিবার্য এ পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার একক ও যৌথ প্রয়াস অব্যাহত রাখা। বিষয়টি জ্ঞানতত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক– উভয়ই।

৪. তাহলে অর্থনীতিশাস্ত্রের শিক্ষা (কার্য) ক্রম কী হওয়া বাঞ্ছনীয়?

একবিংশ শতকের অর্থনীতিশাস্ত্র এখন প্রধানত "ইনস্ট্রুমেন্টাল ইকনমিকস" যেখানে অর্থনীতির নীতি নেই, নেই দার্শনিক বিষয়াদি, নেই জনকল্যাণের বিষয়াদির অগ্রাধিকার। এ শাস্ত্রে এখন যা দাপট দেখাচ্ছে তা হলো নীতি-নৈতিকতাহীন গণিতের ব্যবহার যাকে বলা চলে "প্রায়োগিক গণিতের শাখা মাত্র" (a branch of applied mathematics)। এ শাস্ত্রে এ দাপট দেখাচ্ছে নয়া-উদারবাদ যা আসলে অর্থশাস্ত্রের আদি নীতি-দর্শন থেকে বহু-যোজন দূরের। এ শাস্ত্র এখন এই শাস্ত্রের বিবর্তিত মৌলিক চিন্তাদর্শনের ধার ধারে না। এ শাস্ত্রে এখনও বাজারের অদৃশ্য হাত-ই প্রধান। এ শাস্ত্রে প্রধান বিচার্য যার ভিত্তিতেই মনে করা হয় বাজার অর্থনীতি ভারসাম্যপূর্ণ এবং যার ভিত্তিতেই অনুরূপ নীতিমালা সুপারিশ করা হয়; এখনও বিশ্বাস করা হয় প্রত্যেকের স্ব-স্বার্থকে প্রাধান্য দিলেই শেষ পর্যন্ত সবারই মঙ্গল হবে – এ বিশ্বাসের রূপ-প্রকৃতি যাই হোক না কেন অর্থনৈতিক জীবনে অনিশ্চয়তা বিশ্লেষণে এ শাস্ত্র (বলা চলে) ব্যর্থ হয়েছে। তাহলে এখন যে অর্থনীতি পাঠ করানো হচ্ছে এবং উচ্চ-উচ্চতর ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে তার প্রকৃত মূল্য কোথায়? আসলে তেমন কোনো মূল্য নেই–স্যুট-বুট পরা কেরানি বানানো ছাড়া। এ শাস্ত্রে এখন যারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ বা উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করছেন তাদের যেমন ফান লি, জেনোফনেস, চাণক্য, এ্যারিস্টটল, ইবনে খালদুন, টমাস একুইনাস, টমাস মান, উইলিয়াম পেটি, এডাম স্মিথ, কার্ল মার্কস জানার প্রয়োজন পড়ে না তেমনি তাদের এখন মানুষ-সমাজ-ইতিহাস-রাজনীতির বিবর্তন ও বৈশিষ্ট্য না জানলেও চলে। একজন অর্থনীতিবিদ 'মানুষ' নাকি যন্ত্রবিশেষ? এ প্রশ্নের সদুত্তর এখন খুব সহজ নয়!

এক সময়ের দর্শন ও নীতিশাস্ত্র থেকে অর্থনীতিশাস্ত্রের বিচ্ছেদ ঘটেছে; স্থায়ী বিচ্ছেদ। সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার মতোই অর্থনীতিশাস্ত্র এখন 'খণ্ডিত' ও 'গণ্ডিবদ্ধ' (fragmented ও compartmentalized)। অবস্থাটা এমনই যে এখন চাহিদা-সরবরাহের চিরাচরিত বিধি এবং তার সাথে সম্পর্কিত গাণিতিক মডেল প্রণয়ন-এর বাইরে বিচরণের প্রয়োজন পড়ে না। আর বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয় এখন এ সবেই অতি আগ্রহী। এ এক মহা দুর্দশা! মহা বিপর্যয়! এ মহাদুর্দশা থেকে পরিত্রাণ জরুরি। এ লক্ষ্যে আমার মনে হয় অর্থনীতিশাস্ত্রের শিক্ষা কার্যক্রমের (curriculum) ধরন-বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত নিম্নরূপ (আমি জানি আপাতত আমার প্রস্তাব গৃহীত হবে না, এবং এও জানি যে সময়ের সাথে সাথে আমার প্রস্তাবটি ভাবনার বিষয়ই হবে)।

আমার প্রস্তাবটি উত্থাপনের আগে আরো একটা কথা বলে রাখতে চাই। তাহলো 'অনিশ্চয়তা' (uncertainity) এবং 'ঝুঁকি' (risk) সমার্থক নয়। সাধারণভাবে দেখা যাচ্ছে যে, যে অর্থনীতি যত উপরের দিকে যাচ্ছে (প্রচলিত অর্থে 'উন্নতি' হচ্ছে) সে অর্থনীতি স্থীতিশীল (stable) করতে অথবা সে অর্থনীতির স্থিতিশীলতা আনতে ও প্রবৃদ্ধি (growth) নিশ্চিত করতে অনিশ্চয়তার মাত্রা তত বেশি, এবং এ মাত্রা সর্বোচ্চ দেখা যাচ্ছে বিনিয়োগ বাজার (investment market) এবং আর্থিক বাজারে (financial market)। আর এ দুই বাজারের অনিশ্চয়তা (uncertainity) সমগ্র অর্থনীতিকে ঝুঁকিগ্রস্থ (risk) করছে। অর্থনীতিশাস্ত্রের ব্যষ্টিক (micro economics) এবং সামষ্টিক (macro economics)–কোনো শাখাই আর এ সমস্যা পূর্ণাঙ্গ বুঝে উঠতে পারছে না (যাকে সাধারণ অর্থে বলে macro-micro mismatch)। তথাকথিত 'rational expectation'-সংশ্লিষ্ট অনুসিদ্ধান্ত কাজ করছে না। সম্ভবত যা কাজ করার কথা তা হলো এ রকম যে "বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে– যেমন উৎপাদন, কর্মসংস্থান, মূল্যস্ফীতির হার, প্রবৃদ্ধি, মানব সমৃদ্ধি, আয় ও সম্পদ বৈষম্য, পরিবেশ বিপর্যয়, অর্থনৈতিক ভবিষ্যতবাণী, সামাজিক নির্ণায়কসমূহ স্থান-কালভেদে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানভিত্তিক অনুসিদ্ধান্ত কাজ করে।"

উপরে যা বললাম এসবের নিরিখেই প্রশ্ন–তাহলে অর্থনীতিশাস্ত্র নিয়ে আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ার কোন পর্বে/কোন স্তরে কী কী বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে? এ নিয়ে আমি আমার প্রস্তাব (বলা যেতে পারে পুনর্গঠন প্রস্তাব) দুভাগে বিভক্ত করেছি। প্রথমটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান (অনার্স) পর্বের জন্য, আর দ্বিতীয়টি মাস্টার্সসহ পোস্ট গ্রাজুয়েট পর্বের জন্য। আমার প্রস্তাব দুটি নিম্নরূপ:

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স পর্বের জন্য প্রস্তাব: আমার প্রস্তাবের মূল ভিত্তি-যুক্তি হলো "অর্থনীতিশাস্ত্র প্রকৃতি বিজ্ঞান নয়, অর্থনীতিশাস্ত্র নীতিশাস্ত্রীয় বিজ্ঞান"। আর তাই অর্থনীতিবিদকে যথাযোগ্য মাত্রায় জানতে হবে দর্শন, ইতিহাস, গণিত, রাষ্ট্রনীতি, মানুষের চিন্তা ও মনস্তত্ত্ব, এবং সামাজিক-রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং অর্থনীতিশাস্ত্রে যারা প্রথম ডিগ্রি (৪ বছরের অনার্স অথবা আন্ডার গ্রাজুয়েট স্তর) অর্জন করতে যাচ্ছেন, তাদের ম্যাক্রো ও মাইক্রো অর্থনীতির (যেখানে কিছুটা গণিতশাস্ত্র জানা প্রয়োজন হয়) জ্ঞান থাকাটা যথেষ্ট নয়। সমাজের জন্য উপযোগী অর্থনীতিবিদ হবার জন্য এ স্তরে যেসব বিষয়ে জ্ঞানার্জন অত্যাবশ্যক তা হলো: দর্শন (বিশেষত নীতিদর্শন), অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস, অর্থনীতি চিন্তার ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান এবং রাজনীতি। অনার্স পর্বের শেষ বর্ষে কিছুটা 'বিশেষজ্ঞ' (specialist) বানানোর চেষ্টা হতে পারে তবে গণিতশাস্ত্রের ভার কিছুটা কমানো যেতে পারে। এর ফলে একদিকে যেমন শুধু গণিতের জ্ঞানের জোরে পরীক্ষায় উচ্চ স্থান দখলের (যেমন প্রথম শ্রেণি ইত্যাদি) অপ্রয়োজনীয়তা কমবে আর অন্যদিকে আমার প্রস্তাবের মূল ভিত্তি 'অর্থনীতিশাস্ত্র প্রকৃতি বিজ্ঞান নয় তা নীতিশাস্ত্রীয় বিজ্ঞান'–শক্তিশালী হবার ফলে এ স্তরে একজন অর্থনীতিবিদ জ্ঞানসমৃদ্ধ মানুষ হবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স (বা পোস্ট গ্রাজুয়েট) পর্বের জন্য প্রস্তাব: উচ্চতর এ পর্বে আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হলো মাইক্রো ও ম্যাক্রো ইকনমিকস পঠন-পাঠনে এখনকার তুলনায় ভিন্ন পদ্ধতি (কাঠামো) অবলম্বন করা। মাইক্রো ইকনমিকসের ক্ষেত্রে যা পড়ানো হয় তার সাথে ছোট ছোট অনুসিদ্ধান্তভিত্তিক মডেল বিনির্মাণ ও তা টেস্ট করার পদ্ধতি শেখানো এবং এটা ব্যবসা-বাণিজ্য স্কুলের সাথে সম্পৃক্ত করা। আর ম্যাক্রো ইকনমিকসে যারা মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য একধরনের joint degree বা যৌথ ডিগ্রি-র ব্যবস্থা করা যেখানে অর্থনীতিশাস্ত্র ও অর্থনীতি-বহির্ভূত শাস্ত্রকে মোটামুটি সমান গুরুত্ব দেয়া হবে। অর্থনীতি-বহির্ভূত শাস্ত্রগুলো হতে পারে দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, জীববিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান ইত্যাদি। এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব হলো যারা ম্যাক্রো ইকনমিকস-এ মাস্টার্স বা উচ্চতর ডিগ্রি নেবেন তাদের যেন বাধ্যতামূলকভাবে দর্শন-ইতিহাস-এর শিক্ষক ও ছাত্রের সাথে interact করানো হয় (এবং ওদেরকেও ম্যাক্রো ইকনমিকস শেখানো হয়)। অর্থাৎ মাস্টার্স লেভেলে যারা ম্যাক্রো ইকনমিকসের বিশেষজ্ঞ হবেন তাদের অর্থনীতির স্থিতিশীলতা, ভারসাম্য, প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন-এর উপর সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নীতির (policy অর্থে) প্রভাব-অভিঘাত (implications) জানলেই চলবে না জানতে হবে ঐসব অর্থনৈতিক নীতিসমষ্টির সামাজিক ও নৈতিক প্রভাব-নিহিতার্থ (social and

ethical implications)। উচ্চতর পর্যায়ের মাইক্রো-ম্যাক্রো ইকনমিকসের এ বিভক্তি অন্যান্য সুবিধের মধ্যে আরো যে বড় ধরনের সুবিধে সৃষ্টি করতে সক্ষম তা হলো ম্যাক্রো ইকনমিস্টদের মন-মনন মাইক্রো ইকনমিকস-অভ্যাস (habit) মুক্ত করবে, এবং একই সাথে সমগ্র অর্থনীতিশাস্ত্রের পঠন-পাঠনকে নিউটনীয় একরৈখিক সূত্র থেকে মুক্ত করবে।

সুতরাং শেষ কথা হলো একদিকে সমগ্র অর্থনীতিশাস্ত্রকে শাস্ত্রীয় দর্শনের দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করতে হবে, আর অন্যদিকে আনুষ্ঠানিক ডিগ্রি অর্জনের পঠন-পাঠন পদ্ধতিরও পুনর্গঠন করতে হবে। আমি এসবের উত্থাপক মাত্র। এসব নিয়ে এ মুহূর্তে তেমন কেউ ভাবছেন কী না তা নিয়ে আমি নিশ্চিত নই। তবে যুক্তি থাকলে ভবিষ্যতে এ নিয়ে ভাবা হবে। তখন যারা ভাববেন তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আরো সুনির্দিষ্ট ভাবনা চিন্তার কথা বলবেন; আরো স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেবেন। এ বিষয়ে আমি আশাবাদী। কারণ সমাজ ও প্রকৃতি যেখানে স্থির নয় গতিময় (not static but dynamic) সেখানে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত কোনো শাস্ত্রও স্থির হতে পারে না তাকে গতিময় হতেই হবে।